ইউনিট ২: জাতীয় উন্নয়নের সমসাময়িক ধারণা

ভূমিকা

সাধারণত জীবন ধারণ বলতে ক্ষেত্রবিশেষে প্রয়োজনীয় উপকরণ যেমন- অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও ভোগ্যপণ্য ইত্যাদিকে বোঝায়। অর্থাৎ যে যত বেশি ভোগ করবে এবং যত বেশি উন্নত সুন্দর পরিবেশে জীবনযাপন করে তার জীবনযাত্রার মান তত উন্নত বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং জীবনধারণের মানকে জীবনযাত্রার মান বলা হয়। যে দেশের জনগণ উন্নত পরিবেশে উন্নত মানের ভোগ্যপণ্যের ভোগসহ জীবন ধারণের অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করে সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান তথা জীবনধারণ তত উন্নত বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই, আমেরিকা, কানাডা, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপানসহ উন্নত দেশসমূহের জনগণের জীবনধারণ প্রক্রিয়া অতি উন্নত। সুতরাং মানুষ কিভাবে, কোন পরিবেশে জীবনযাপন করে, প্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রী ও সুযোগ-সুবিধা কতটুকু লাভ করে তাকে জীবনযাত্রার মান বলা হয়।

এই ইউনিটে মোট ছয়টি পাঠ রয়েছে। এই পাঠগুলো হল:

পাঠ- ২.১: জাতীয় উন্নয়নের বিকাশ ও প্রক্রিয়া

পাঠ- ২.২: ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উন্নয়নের ধারণা
(অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক)

পাঠ- ২.৩: সার্বিক উন্নয়ন ও সংক্ষিপ্ত উন্নয়ন

পাঠ- ২.৪: জাতীয় উন্নয়নে বিচার্য বিষয়সমূহ

পাঠ- ২.৫: উন্নয়নের পরিমাপক/নির্ণায়কসমূহ
(জিডিপি, জিএনপি, মাথাপিছু আয়, জাতীয় আয়, জিএনএইচ)

পাঠ- ২.৬: প্রত্যাশিত জীবনকাল, জীবনযাত্রার মান

পাঠ ২.১: জাতীয় উন্নয়নের বিকাশ ও প্রক্রিয়া

সামগ্রিকভাবে বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের কাছে উন্নয়ন ধারণাটি বিভিন্ন অর্থ নির্দেশ করে। অতএব উন্নয়নের একটি কার্যকরী ও অর্থবহ সংজ্ঞা জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ একটি কার্যকর সংজ্ঞা এবং উন্নয়নের নির্ণায়কগুলো জানা ব্যতীত উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। উন্নয়নের দুই ধরনের সংজ্ঞা প্রচলিত আছে। যথা– (১) উন্নয়নের প্রচলিত সংজ্ঞা ও (২) উন্নয়নের আধুনিক সংজ্ঞা।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন অর্থনীতিবিদদের ভিন্ন ভিন্ন মতবাদগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থনীতির সাথে জাতীয় উন্নয়নের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পৃক্ত উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন।

উন্নয়নের প্রচলিত সংজ্ঞা

কোন দেশের অর্থনীতির কাঠামোগত পরিবর্তনের ফলে জাতীয় উৎপাদন ও প্রকৃত মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ঘটলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। এটি এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দীর্ঘকালব্যাপী কোন দেশের প্রকৃত জাতীয় আয় অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রক্রিয়া বলতে কতগুলো শক্তির সম্মিলিত কার্যক্রম বুঝায় যা দীর্ঘসময় ধরে কাজ করে, অর্থনৈতিক চলকসমূহের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। সুতরাং অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে দেশের–

- জাতীয় আয়;
- মাথাপিছু আয়;
- উৎপাদন ক্ষমতা;
- জীবনযাত্রার মানের ক্রমোন্নতির একটি দীর্ঘকাল মেয়াদি প্রক্রিয়া।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের কোনো সঠিক বা একক সংজ্ঞা না থাকলেও বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। যেমন–

- অধ্যাপক এ. লুইন (A. Lewis)-এর মতে প্রতি ঘণ্টা কাজের বিপরীতে যদি উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, তবে বুঝতে হবে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে।
- অধ্যাপক স্লাইডার (Prof. Snider)-এর মতে অথনৈতিক উন্নয়ন বলতে মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতার দীর্ঘকালব্যাপী বৃদ্ধিকে বুঝায়।

অর্থনৈতিক উন্নয়নের আধুনিক ধারণা

বর্তমান কালে অধিকাংশ অর্থনীতিবিদ দারিদ্র, সমতা ও নিয়োগ এর আলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা প্রকাশ করেন।

M. P. Todaro, C. P. Kindle Berger, Dudley Seers প্রমুখ আধুনিক অর্থনীতিবিদগণের মতে– অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া (Multi-Dimensional Process) যার মাধ্যমে নিম্নোক্ত উপাদানগুলোর পরিবর্তন সাধিত হয়। যেমন–

- সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন;
- জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন;
- দরিদ্র জনগোষ্ঠির কল্যাণ;
- উৎপাদন কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন;
- জনগণের মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন;
- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য হ্রাস;
- শ্রম দক্ষতা, ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধিসহ মানব সম্পর্কের উন্নয়ন;
- সাংগঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। যেমন– ব্যাংক, বীমা, শেয়ার বাজার ইত্যাদি;
- সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পরিবেশ সৃষ্টি;
- সাংস্কৃতিক পরিবেশের উন্নয়ন;
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতিমুক্ত গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও উন্নততর মানসিকতা সৃষ্টি।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসব মৌলিক বিষয়ের পরিবর্তন সাধিত হলে জাতীয় আয় বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ার এ ধারাকে আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে চিহ্নিত করেছেন।

- অধ্যাপক পল বেরন (Paul Barron)-এর মতে "সময় ব্যবধানে বস্তুগত সম্পদের মাথাপিছু উৎপাদনের যে বৃদ্ধি ঘটে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।
- অধ্যাপক উইলিয়ামস্ ও বাট্রিক (Prof. Williams and Batrick)-এর মতে, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোন দেশের বা অঞ্চলের জনসাধারণ প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে মাথাপিছু পণ্য ও সেবা উৎপাদন বৃদ্ধি করে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে।
- অধ্যাপক রস্টো (Prof. Rostow) অর্থনৈতিক উন্নয়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কতকগুলো প্রবণতার কথা বলেছেন। যেমন–
  - মৌলিক বিজ্ঞানের প্রসার।
  - অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য আইনের জন্য বিজ্ঞানকে ব্যবহারের প্রবণতা।
  - প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রবণতা।
  - নতুন কলাকৌশল ও যন্ত্রপাতি আবিষ্কারের প্রবণতা।
  - বস্তুগত অগ্রগতি সাধনের প্রবণতা।
  - ভোগ ও সঞ্চয়ের প্রবণতা।
  - উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও উপাত্তের আদল প্রদল।
  - সন্তান লাভের প্রবণতা।

সুতরাং, কোন দেশের উন্নয়ন বলতে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই বুঝায় এবং যদি এই প্রবণতাগুলো কোন সমাজের উপর কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে তবে তার অনিবার্য ফলাফল হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন।

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যে প্রক্রিয়ায় একটি দেশে একই সাথে পরিমানগত এবং গুণগত

পরিবর্তনের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়, মৌলিক চলকগুলোর মধ্যে পরিবর্তন সূচিত হয় এবং যার মাধ্যমে উন্নয়নের গতি তরান্বিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
   ক. জনগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা
   খ. মাথাপিছু উৎপাদন ক্ষমতা
   গ. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন
   ঘ. একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া

২. আধুনিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন কী?
   ক. গুণগত উন্নয়নের মাত্রা বৃদ্ধি
   খ. পরিমাণগত মাত্রা বৃদ্ধি
   গ. উন্নয়নের গতি তরান্বিত করা
   ঘ. প্রযুক্তিগত উন্নয়নের প্রবণতা

উত্তরমালা: ১. ঘ, ২. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. উন্নয়নের একটি প্রচলিত সংজ্ঞা লিখুন।
২. উন্নয়ন একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া; সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন।
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিবেচ্য উপাদানগুলো উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন অর্থনীতিবিদগণের মতবাদগুলো উল্লেখপূর্বক অর্থনীতির সাথে জাতীয় উন্নয়নের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ২.২: ব্যষ্টিক (Micro) ও সামষ্টিক (Macro) উন্নয়নের ধারণা
(অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট)

ব্যষ্টিক শব্দটির ইংরেজি শব্দ হলো Micor। এটি একটি প্রাচীন গ্রীক শব্দ Mikros থেকে এসেছে যার অর্থ হলো অতি ক্ষুদ্র বা Very Mall। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে শাখায় তার উপাত্তসমূহের কার্যাবলি ও বৈশিষ্ট্যগুলো পৃথক পৃথকভাবে অতি ক্ষুদ্রাকারে পর্যালোচনা করে– সেই শাখাকে ব্যষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলে। যেমন– উৎপাদন, বণ্টন, বিনিয়োগ, ভোগ, আয়-ব্যয়, নিয়োগ, বিনিময়, সঞ্চয়, অভাব ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উন্নয়নের ধারণা বা সংজ্ঞা লিখতে পারবেন;
- ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উন্নয়নের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন;
- ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উন্নয়নের মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

ব্যষ্টিক অর্থনীতি

অধ্যাপক K. E. Boulding বলেছেন, Micro Economics is the study of particular firm, particular household, individual prices, income, individual industries and particular commodities- অর্থাৎ ব্যষ্টিক অর্থনীতি কোন নির্দিষ্ট ফার্ম, কোন নির্দিষ্ট পরিবার, একক দ্রব্যমূল্য, মুজুরি, আয় এবং নির্দিষ্ট দ্রব্য সম্পর্কে আলোচনা করে।

ব্যষ্টিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

- ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে আলোচনা করা হয়।
- পৃথক পৃথক ক্ষেত্রের চলকসমূহ আলোচিত হয়।
- এই অর্থনীতির পরিধি অতি ক্ষুদ্র ও আংশিক ভারসাম্য স্থাপিত হয়।
- এ অর্থনীতি একটি সমাজের বা দেশের আংশিক চিত্র পাওয়া যায়।
- ব্যষ্টিক অর্থনীতি উন্নয়নের তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করে।

সামষ্টিক অর্থনীতি (Macro Economics):

ইংরেজিতে সামষ্টিক শব্দটিকে বলা হয় Micro যা প্রাচীন গ্রীক শব্দ Makros থেকে এসে এর অর্থ বৃহৎ বা সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে শাখায় উন্নয়নের তত্ত্ব উপাত্তগুলোকে অত্যন্ত বৃহৎ আঙ্গিকে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তাকে সামষ্টিক বা Macro অর্থনীতি বলে। এক্ষেত্রে উপাত্তসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে বিশ্লেষণ না করে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয়। যেমন– কোন পরিবার বা ব্যক্তির একক আয়ের আলোচনা না করে জাতীয় আয় বা উৎপাদন নিয়ে আলোচনা করা। অর্থাৎ সার্বিকদিক উন্নয়নের প্রয়োগিক বিশ্লেষণ করাই হচ্ছে সামষ্টিক উন্নয়ন।

সামষ্টিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

- অর্থনৈতিক উন্নয়নে যে শাখায় তত্ত্ব উপাত্তগুলোকে সামগ্রিকভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তাকে সামষ্টিক বা Macro অর্থনীতি বলে।
- Macro শব্দটি প্রাচীন গ্রীক শব্দ Macros থেকে এসেছে। এই অর্থ হলো বৃহৎ বা সামগ্রিক।
- জাতীয় উন্নয়নে সকল উপাদান ও ক্ষেত্রকে বিবেচনায় রেখে চলকসমূহ আলোচিত হয়।
- সামষ্টিক উন্নয়নের পরিধি ব্যাপক।
- সামষ্টিক উন্নয়নে একটি সমাজের বা দেশের সামগ্রিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সামষ্টিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত নিলে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম হয়।
- সামষ্টিক অর্থনীতি প্রায়োগিক দিক আলোচনা করে।

ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মধ্যকার পার্থক্য:

ব্যষ্টিক অর্থনীতি	সামষ্টিক অর্থনীতি
ব্যষ্টিক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Micro।	সামষ্টিক শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ Macro।
Micro প্রাচীন গ্রীক শব্দ Mikros থেকে এসেছে।	এটি প্রাচীন গ্রীক শব্দ Makros থেকে এসেছে।
অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে শাখায় একক উপাত্তসমূহের কার্যাবলী ও পর্যালোচনা করা হয় সেই শাখাকে ব্যষ্টিক অর্থনীতি বলে।	অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে শাখায় অর্থনীতির তত্ত্ব উপাত্তগুলোকে অত্যন্ত বৃহৎ পরিসরে বা সামগ্রিকভাবে বিশ্লেষণ করা হয় তাকে সামষ্টিক অর্থনীতি বলে।
ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে বিষয়বস্তুকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে আলোচনা করা হয়।	এক্ষেত্রে বিষয়বস্তুকে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করা হয়।
ব্যষ্টিক অর্থনীতির পরিধি ক্ষুদ্র।	সামষ্টিক অর্থনীতির পরিধি ব্যাপক।
ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে একটি পরিবার বা সমাজের আংশিক চিত্র তুলে ধরা হয়।	সামষ্টিক অর্থনীতিতে একটি সমাজ বা দেশের সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠে।
এ অর্থনীতি বিবেচনায় বা বিশ্লেষণ করে সামগ্রিক সিদ্ধান্ত নিলে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।	সামষ্টিক অর্থনীতি বিশ্লেষণ করে জাতীয় অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত নিলে তাতে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
ব্যষ্টিক অর্থনীতি উন্নয়নের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা করে।	সামষ্টিক অর্থনীতি উন্নয়নের প্রায়োগিক দিক নিয়ে আলোচনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. ব্যষ্টিক (Micro) উন্নয়ন বলতে–
ক. উপাত্তসমূহের কার্যাবলি ও বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করা
খ. কেবলমাত্র একক ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করে
গ. অতি ক্ষুদ্রাকারে বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোচনা করা
ঘ. ব্যষ্টিক উন্নয়ন বাস্তব দিক আলোচনা করে

উত্তরমালা: ১. ক।

খ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক উন্নয়ন বলতে কী বোঝায়? এ দুটির মধ্যকার পার্থক্য লিখুন।

২. অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ প্রবণতাগুলো কিভাবে উন্নয়নের গতি তরান্বিত করতে সক্ষম হবে; বিস্তারিত লিখুন।

পাঠ ২.৩: সার্বিক উন্নয়ন ও সংক্ষিপ্ত উন্নয়ন

বাংলাদেশে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠ পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর সুষ্ঠ বাস্তবায়ন। জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি স্বরূপ শিক্ষার উন্নয়নে বাংলাদেশে প্রতিটি ক্ষেত্রে মেয়াদী পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কৌশল ও বিভিন্ন মুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রক্রিয়াকে উন্নয়ন পরিকল্পনা বলে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- পরিকল্পনার সূচনা/প্রক্রিয়া/প্রয়োজনীয়তা/উপায় ও প্রকারভেদ উল্লেখ করতে পারবেন;
- পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো উল্লেখ করতে পারবেন।

পরিকল্পনার সূচনা

দেশ, জাতি ও সমাজের সকল স্তরে যে কোন কাজ সুসম্পন্ন করতে প্রয়োজন **'পরিকল্পনা'**। পরিকল্পনা ব্যতীত কোন কাজ সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা যায় না। সুতরাং সমাজের প্রয়োজনে এবং উন্নয়নে প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা।

১৯১৬ সালে হেনরি ফ্যাত্তল (Henry Fayol) ব্যবসা বিষয়ক পরিকল্পনার ইতিহাস উল্লেখ করেন। ১৯৫৮ সালে ডেভিড ইউইং (David Ewing) কারবার ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনার উপর গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদিতে পরিকল্পনার প্রকৃতি, নীতিমালা, কৌশল, বৈশিষ্ট্য এবং পর্যায়সমূহের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন। পরবর্তীতে এ গবেষণার আরও বিস্তার ঘটে।

পরিকল্পনার ধারণা

পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায় তা নিয়ে পরিকল্পনাবিদদের ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়। যেমন–

টেরি'র (Terry) মতে, Planning is constructive reviewing of future need so that present actions can be adjusted in view of the established goal.

It is a deliberate conscious research used to formulate design and orderly sequence of action through which it is expected to reach the objective. অর্থাৎ পরিকল্পনা হলো ভবিষ্যতে চাহিদার গঠনমূলক পর্যালোচনা যেন নির্ধারিত লক্ষ্যের সাহায্যে কর্মকান্ডের সাম্যতা বিধান করা যায়। এর মাধ্যমে কাজটির উদ্দেশ্যে পৌঁছানো প্রত্যাশা করা যায়।

অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট বা পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পাদনের জন্য গৃহীতব্য কার্যবলীর ছক বা তালিকা ও কর্মপন্থার রূপ রেখাই হল **"পরিকল্পনা"**।

ওয়াল্টার (Walter)-এর মতে Planning is pre-thinking, thinking-up, thinking out and thinking through, it includes pre-thinking what and how to do it the thinking through of the course and methods and action. অর্থাৎ পরিকল্পনা হচ্ছে পূর্ব চিন্তা, চিন্তার বিকাশ, চিন্তার প্রকাশ ও চিন্তাধারা, কাজের গতি ও পদ্ধতির চিন্তাধারা।

অধ্যাপক হায়েক বলেন, "পরিকল্পনা হল একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উৎপাদন কার্য-নিয়ন্ত্রণ করা"।

অধ্যাপক রবিনস্-এর মতে, "একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও পছন্দের ভিত্তিতে অর্থনৈতিক কার্যাবলি পরিচালনাই হল– **পরিকল্পনা**।"

সুতরাং যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যে সকল প্রশ্নের অবতারণা হয় তা হলো;

- কী করতে হবে? (What to do)
- কেন করতে হবে? (Why to do)
- কখন করতে হবে? (When to do)
- কারা/কে করবে? (Who will do)
- কী উপায়ে করতে হবে? (How to do?)
- কত সময় লাগবে? (How long to be needed?)

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন নীতিমালা

পরিকল্পনার সাধারণ প্রক্রিয়া হলো–

- যথাযথ কর্তৃপক্ষ গঠন;
- মানুষই উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু এমন মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করা;
- প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ;
- পরিবেশের ভারসাম্য ও সুরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ;
- দারিদ্র বিমোচনকে অগ্রাধিকার প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আয় বৈষম্য হ্রাসকরণে সমান গুরুত্বারোপ করা;
- জন মানুষের মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকারকে সুরক্ষা দিয়ে ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন করা;
- সমাজ প্রক্রিয়ায় নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টিকরণ;
- ধর্ম, বর্ণ ও লিঙ্গ নির্বিশেষে মানব উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- অপরিকল্পিত নগরায়ন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা;
- উন্নয়নে আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
- পরিবেশ বান্ধব অবকাঠামো গড়ে তোলা;
- লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ;
- নির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা;
- সম্পদ সংগ্রহ, বরাদ্দ ও ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা;
- সুশৃঙ্খল কর্ম প্রচেষ্টা পরিচালনা;
- বাস্তবায়ন কৌশল প্রয়োগ করা;
- পরিবীক্ষণ ও ফলাবর্তন;
- মূল্যায়ন।

উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা

- সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- প্রয়োজনীয় সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ করা;
- কাজের গতি সঞ্চার করা;
- গুরুত্বপূর্ণ কাজ চিহ্নিত করা;
- প্রতিষ্ঠানের সকলকে কাজে সম্পৃক্ত করা, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা;
- সম্পদের যথাযথ ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য অর্জন, উন্নয়ন ও অগ্রগতি নিশ্চিত করা।
- দারিদ্র বিমোচন;
- বেকারত্ব হ্রাস;
- তথ্য প্রযুক্তির বিকাশ;
- অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন;
- জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধিকরণ;
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ;
- আয় বৈষম্য দূরীকরণ;
- স্বনির্ভরতা অর্জন;
- শিল্পের সুষম বণ্টন;
- শোষণহীণ সমাজ গঠন;
- জাতীয় সম্পদের যথাযথ ব্যবহার;
- খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন;

অতএব উপরোক্ত বিষয়গুলো বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উন্নয়ন পরিকল্পনার উপায়/প্রক্রিয়া

উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সফলতায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচ্য রাখা প্রয়োজন। যেমন–

- অভিজ্ঞ পরিকল্পনাবিদ নিয়োগ;
- সঠিক তথ্য সংগ্রহ;
- টেকসই পরিকল্পনা প্রণয়ন;
- দুনীর্তিমুক্ত প্রশাসন ব্যবস্থা;
- দক্ষতা ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- আমলাতান্ত্রিকতার অবসান;
- মূলধনের যোগান;
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা;
- আইন শৃঙ্খলার উন্নয়ন;
- তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ;
- লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ;
- অগ্রাধিকার খাত নির্বাচন;
- নমনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন;

- সামাজিক ভিত্তি বিবেচনায় রাখা;
- প্রশাসক ও পরিকল্পনাবিদদের মধ্যকার সম্পর্ক দৃঢ়করণ;
- উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচলন;
- উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- যথাযথ মূল্যায়ন;
- বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তা;
- মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

অতএব উন্নয়ন পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা অপরিহার্য।

উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

জাতীয় উন্নয়নের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। যেমন–

প্রকারভেদ →
- কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা ও বিকেন্দ্রীয় পরিকল্পনা,
- সার্বিক পরিকল্পনা ও আংশিক পরিকল্পনা,
- কার্যগত পরিকল্পনা ও কাঠামোগত পরিকল্পনা,
- স্বল্প মেয়াদি, মধ্য মেয়াদি ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা,
- বস্তুগত ও আর্থিক পরিকল্পনা,
- প্রনোদনমূলক পরিকল্পনা ও নির্দেশাত্মক পরিকল্পনা,
- আঞ্চলিক, জাতীয় ও আর্ন্তজাতিক পরিকল্পনা।

সুতরাং কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাকে **"জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা"** বলে। মানব জাতির ইতিহাসে সাম্প্রতিক অগ্রগতি অভূতপূর্ব। শিক্ষা– এই ধারণা বাস্তবায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এবং সমাজ উন্নয়নের কার্যকর উপায়, যেখানে আপামর জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্ভব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে–
ক. বিভিন্নমুখী পরিকল্পনা বা কর্মসূচি গ্রহণ
খ. উপযুক্ত শিক্ষা
গ. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা
ঘ. বিদেশে লোক প্রেরণ করা

২. পরিকল্পনা হলো–
ক. কাজ সম্পাদনের জন্য গৃহীত কার্যাবলি
খ. কর্মপন্থার রূপরেখা
গ. পদ্ধতির প্রয়োগ
ঘ. চিন্তার বিকাশ

৩. পরিকল্পনায় প্রয়োজন–
ক. সমাজের প্রয়োজনে
খ. ব্যক্তির প্রয়োজনে
গ. কোন কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য
ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য

উত্তরমালা: ১. খ, ২. খ, ৩. গ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?
২. পরিকল্পনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী?
৩. উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ উল্লেখ করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গৃহীত বিবেচ্য বিষয়গুলো উল্লেখ করুন।
২. জাতীয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রেক্ষিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে কী আপনি মনে করেন– উল্লেখ করুন।
৩. যে কোন পরিকল্পনার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী? লিখুন।

পাঠ ২.৪: জাতীয় উন্নয়নে বিচার্য বিষয়সমূহ (ব্যক্তি, শ্রেণি, জেন্ডার ও নৃ-গোষ্ঠি ইত্যাদি)

যে প্রক্রিয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়নে মানব সম্পদ, উৎপাদন কৌশল, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দীর্ঘ মেয়াদী মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক নিরাপত্তা ও মানব কল্যাণ অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে তাকে– অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা **"জাতীয় উন্নয়ন"** বলা হয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জাতীয় উন্নয়ন বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- জাতীয় উন্নয়নের নবতর ইস্যুগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়নের পদক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

শিক্ষা সমাজের সাধারণ মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে রূপান্তর করে। তাই দেশের সামাজিক ও আর্থিক অগ্রযাত্রা সূচনায় শিক্ষা পরিকল্পনা একান্ত দরকার। কারণ শিক্ষা পরিকল্পনায় মানব সম্পদ উন্নয়ন, সংগঠন ও সকল উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত থাকে। এ ছাড়া একটি দেশের প্রধান সম্পদ হচ্ছে সে দেশের জনগণ। এ জনগণকে জাতীয় উন্নয়নের প্রধান চালিকা শক্তি হিসেবে গড়ে তুলে কর্মে নিয়োজিত করার মধ্যে যথাযথ পরিকল্পনার গুরুত্ব নিহিত।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) Millenium Development Goals (MDG) পৃথিবীর উন্নয়নে গৃহীত বড় ধরনের যৌথ উদ্যোগ, যেমন- অনুন্নত, উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশসমূহ একযোগে এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে। ২০০০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত 'সহস্রাব্দ শীর্ষ সম্মেলনে' ১৮৯টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বাংলাদেশ সরকারের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পরিকল্পনায়–

- দারিদ্র দূরীকরণ তরান্বিতকরণ কৌশল পত্র ১ ও ২
- মধ্য মেয়াদি বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ)
- ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং
- বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা (এমডিজি)-কে বাস্তবায়নের প্রাধান্য দিয়ে প্রণীত হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য গৃহীত সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পাশাপাশি সরকারি নীতি এবং কৌশলসমূহ সমন্বয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এমডিজি বাস্তবায়নে সারা বিশ্বে বাংলাদেশের প্রচেষ্টা অনুকরণীয় এবং একটি "রোল মডেল" হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

জাতীয় উন্নয়নের ইস্যু

জাতীয় উন্নয়ন কার্যকরিকরণের মাধ্যমে ১৯৯০ সাল থেকে ২১ শতকে বিশ্বের উন্নয়নে অগ্রাধিকার নির্ণয়ে বিশ্বের উন্নত, উন্নয়নশীল, অনুন্নত সকল দেশ থেকে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা বিশ্ব থেকে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, অশিক্ষা, যুদ্ধ,

রোগ-ব্যাধি নির্মুলে জাতিসংঘ অসংখ্য সভা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করে। ২০০০ সালে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান একটি রিপোর্ট প্রকাশ করেন, "We the people, the role of United Nation at the Twenty first century" শিরোনামে। রিপোর্টে বিশ্বের দারিদ্র্য নিপীড়িত জনগোষ্ঠির উন্নয়নে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে আহ্বান জানান। শীর্ষ সম্মেলনে ১৪৭টি দেশের রাষ্ট্র প্রধানসহ উপস্থিত ১৮৯টি দেশের প্রতিনিধিগণ "সহস্রাব্দ ঘোষণা" অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে এতে স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে ২০০১ সালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডা (IDA) এবং ১৯৯০ এর দশকে অনুষ্ঠিত সম্মেলনের ফলাফল স্বরূপ ৮টি সহস্রাব্দ উন্নয়ন ইস্যু নির্ধারণ করেন। ইস্যুগুলো হলো–

- চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূরীকরণ (Eradicate Extreme Poverty and Hunger)
- সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন (Achieving Universal Primary Education)
- লিঙ্গ সমতা অর্জন ও নারীর ক্ষমতায়ন (Gender Equity and Women Empowerment)
- শিশু মৃত্যু হার হ্রাস (Reduce Child Mortality Rate)
- মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়ন (Improving Maternal Health)
- এইচআইভি/এইডস, ম্যালেরিয়া এবং অন্যান্য রোগ ব্যাধি দমন (Controlling HIV/AIDS, Malaria and other Diseases)
- উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠা (Develop Global Partnership for Development)
- পরিবেশগত স্থিতিশীলতা অর্জন (Achieve Environmental Sustainability)

উল্লেখ্য যে,

- দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি অর্জন করেছে। ৬ এর অধিক হারে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হার অর্জন করায় দরিদ্র জনগোষ্ঠির সংখ্যা ১৯৯১-৯২ সালের ৫৬.৭% এর তুলনায় ২০১০ সালে ৩১.৫% কমে এসেছে। এমডিজি নির্ধারিত টার্গেট এ দারিদ্র্য ব্যবধান হ্রাস ২০১৫ সালের আগেই অর্জন করেছে। মোট জনসংখ্যার ক্ষুধার্ত জনগোষ্ঠির হার ১৯৯১ সালের (৩২.৮%) তুলনায় ২০১৫ সালে (১৬.৪%) এ নামিয়ে এনেছে যা দক্ষিণ এশিয়ার গড় ১৭.৬% এর তুলনায় ও কম।

- প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা ইতোমধ্যে অর্জন করেছে। শিক্ষায় প্রবেশাধিকার, ঝরে পড়ার হার হ্রাস ইত্যাদিতে ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার ৯৭.৭% (এমডিজি টার্গেট) আনয়নে ২০১৪ সাল নাগাদ ১০০% পূরণে সক্ষম হবে। তবে চরম দারিদ্র, প্রান্তিক জনগোষ্ঠি, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু, শিশু শ্রম, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অবস্থানগত দুর্গমতা নিট ভর্তির হার উন্নীতকরণে বাধা হয়ে দাড়িয়েছে।

- লিঙ্গ সমতা অর্জনে বাংলাদেশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় ইতিমধ্যে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। মেয়েদের উপবৃত্তি কর্মসূচি ও টিউশন ফি মওকুফ এক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ হিসেবে সর্বজন গৃহীত হয়েছে। উচ্চ শিক্ষার স্তরে ছেলে ও মেয়ে শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ সমতা ইনডেক্স (Gender Parity Index- GPI) হয়েছে ০.৭৩ (২০১৩ সালে U.G.C কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্য)। বেকারত্বের হারে নারী ও পুরুষের পার্থক্য ক্রমেই সংকুচিত হয়ে আসছে।

  ২০১১ সালে নারী নীতি প্রণয়ন ছাড়া নারী বান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচির পাশাপাশি নারীর ক্ষমতায়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন স্তরে নারীর অংশগ্রহণ এমনকি প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির উন্নয়নে যথেষ্ট অগ্রগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। আয় বর্ধনমূলক ও

উৎপাদনশীল কাজে নারীদের অংশগ্রহণ জীবনমান উন্নয়নে সহায়তা করে বিধায় সরকার কর্তৃক ইতোমধ্যে বিভিন্নমুখী সুযোগ সৃষ্টির সম্ভাবনার পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

- শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে বাংলাদেশ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার নির্ধারিত সময়ের আগেই অর্জন করেছে। পাশাপাশি টিকাদান কর্মসূচি, ডায়রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও ভিটামিন "এ" ক্যাপসুলের সরবরাহ ক্ষেত্র বিশেষে যথেষ্ট অবদান রেখেছে।
- বাংলাদেশ মাতৃমৃত্যুর হার ২০০১-২০১০ সাল পর্যন্ত গড়ে ৩.৩% হারে কমেছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মীর সহায়তায় সন্তান প্রসবের সুবিধা গ্রহণকারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।
- সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমনের হার হ্রাসে বাংলাদেশ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। যেমন- এইচআইভি (HIV) সংক্রমনের হার ০.১% এর কম। ম্যালেরিয়া রোগে মৃত্যুর হারও যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে।
- বাংলাদেশে মাত্র ১৩.৪০ ভাগ বনভূমি রয়েছে। সরকার সামাজিক বনায়নের মাধ্যমে বনভূমি বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি এবং গণসচেতনার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে এবং ক্রমান্বয়ে সাফল্য অর্জন করছে। আধুনিক স্যানিটেশন ব্যবস্থা গ্রহণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গণসচেতনতা বৃদ্ধিতে আপ্রাণ চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়নের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং সমাপ্তকরণে সরকারি পর্যায়ে লক্ষ্য ভিত্তিক বিশেষ তত্ত্বাবধানের পাশাপাশি প্রয়োজন উন্নয়ন সহযোগিদের সমন্বিত প্রচেষ্টা বা সহযোগিতা করা। প্রয়োজন বাস্তবায়ন স্তরের আরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ ও বাস্তব কৌশল বা কর্মপন্থার প্রয়োগ। তা হলেই এগিয়ে যাবে উন্নয়নের শীর্ষে বাংলাদেশ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. জাতীয় উন্নয়ন বলতে–
   ক. অবকাঠামোগত উন্নয়ন
   খ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
   গ. উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তির ব্যবহার
   ঘ. উপরের সবকটি

২. মানুষকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদে রূপান্তর করে–
   ক. অর্থ
   খ. সম্পদ
   গ. শিক্ষা
   ঘ. বংশ মর্যাদা

৩. শিক্ষা পরিকল্পনায় বর্ণিত থাকে–
ক. সর্বস্তরে শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা
খ. জনগণকে শিক্ষিত করা
গ. মানব সম্পদ উন্নয়ন, সংগঠন ও উপাদান সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিতকরণ
ঘ. শিক্ষার হার বৃদ্ধিকরণ

৪. সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা (এমডিজি) Millenium Development Goal বলতে–
ক. নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে উন্নয়ন করা
খ. পৃথিবীর উন্নয়নে গৃহীত বড় ধরনের যৌথ উদ্যোগ
গ. দারিদ্র দূরীকরণ
ঘ. সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা

উত্তরমালা: ১. ক, ২. গ, ৩. গ, ৪. খ।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ২০০০ সালের জাতিসংঘের রিপোর্টে বিশ্বের সার্বিক উন্নয়নে কোন কোন বিষয়াবলি বিবেচনায় রাখা হয়?
২. কত সালে বাংলাদেশে নারীনীতি প্রণয়ন করা হয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে সামর্থ হয়েছে। উল্লেখ করুন।
৩. শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে ভর্তির ক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা কতটুকু সার্থকতা অর্জন করেছে।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ২০০১ সালে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন এজেন্ডা এবং ১৯৯০ এর দশকে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে সহস্রাব্দ উন্নয়ন ইস্যুগুলো বিস্তারিত লিখুন।
২. ২০০১ ও ১৯৯০ দশকের সম্মেলনে অংশগ্রহণপূর্বক বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করেছে এবং কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৫: উন্নয়নের পরিমাপক/নির্ণায়কসমূহ
(জিডিপি, জিএনপি, মাথাপিছু আয়, জাতীয় আয়, জিএনএইচ)
Indicators of Economic Development

জাতীয় উন্নয়নের বিষয়টি বিবেচনায় রেখে যখন একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে বা হয়েছে কিনা তা পরিমাপ করার জন্য অর্থনীতির ভিতরে যে সকল চলককে (Indicators) বিবেচনা করা হয় সেগুলোকে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিমাপের সূচক/মাপকাঠি/নির্দেশক বলা হয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্ণায়কগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন;
- জাতীয় উন্নয়নের সাথে অর্থনীতির সম্পৃক্ততা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- অর্থনৈতিক উন্নয়নের চলকসমূহের বিস্তারিত বর্ণনা করতে পারবেন;
- জাতীয় উন্নয়নে এ সকল নির্ণায়কগুলোর গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারবেন।

জাতীয় জীবনে যে কোন উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পরিমাপক হচ্ছে– মাথাপিছু আয়। যেসব দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় যত বেশি সে দেশ তত বেশি উন্নত এবং তাদেরকে **''উন্নত''** দেশ বলা হয়। কারণ মাথাপিছু আয় বেশি থাকা সত্ত্বেও যদি অর্থনীতি স্বনির্ভর না হয়, নিজস্ব ধারায় পরিচালিত না হয়, বিদেশী প্রযুক্তি নির্ভর হয় এবং খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভরশীল হয় তাহলে উন্নত দেশ বলা যাবে না। ক্ষেত্রবিশেষে উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলেও জনগণকে যদি আইন শৃঙ্খলা, হিংসাত্মক ও অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত রাখা যায়, বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ ও উন্নত হলে, সবার জন্য শিক্ষা ব্যবস্থা প্রসারিত হলে জাতীয় কল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রসমূহ বৃদ্ধি পাবে।

নিম্নে উন্নয়নের নির্ণায়কগুলো উল্লেখ করা হলো–

মাথাপিছু আয়: মাথাপিছু আয় দ্বারা সহজেই একটি দেশের সাথে অন্য দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় তুলনামূলক আলোচনা করা যায়। কারণ অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান নির্ধারক হলো জনগণের মাথাপিছু আয়। মাথাপিছু আয়কে কোন দেশের দ্রব্য ও সেবার উৎপাদনের নির্ধারক হিসেবে দেখা হয়। যদি ও মাথাপিছু আয়কে অর্থনৈতিক উন্নয়নের একমাত্র পরিমাপক হিসেবে বিবেচনায় আনা যাবে না। কারণ GNP (Gross National Product)-এর মধ্যে অনেক দ্রব্য ও সেবা অন্তর্ভুক্ত হয় না।

মৌলিক চাহিদা পূরণ: মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো বলতে, খাদ্য বস্ত্র ও বাসস্থানকে বোঝায়। যে দেশে এ সকল চাহিদা যতবেশি সে দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে বলা হয়।

আয় বণ্টন: জাতীয় আয়ের বণ্টনকে সে দেশের জাতীয় উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়।

আর্থিক কল্যাণঃ আর্থিক কল্যাণের মাধ্যমে কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা হয়, কারণ মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি পেলে আয় বৈষম্য হ্রাস পাবে যা দেশের উন্নতি নির্দেশ করে।

পণ্য ও সেবার ভোগঃ উন্নত দেশে পণ্য ও সেবার ভোগের পরিমাণ ও গুণগত মান বেশি হয় অন্যদিকে অনুন্নত দেশে পণ্য ও ভোগের পরিমাপ ও মান অপেক্ষাকৃত কম হয়।

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোঃ যে দেশ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামোতে যত বেশি উন্নত সে দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত উন্নত। যেমন– শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, বিদ্যুৎ ও দক্ষ জনশক্তি।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়নঃ জীবনযাত্রার ক্রমাগত মানোন্নয়ন হচ্ছে অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের অন্যতম সূচক। অতএব জীবনযাত্রার মান্নোয়ন বলতে বোঝায়–

- মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি।
- শিক্ষার হার বৃদ্ধি।
- দ্রব্যমূল স্থিতিশীল থাকা এবং সহজলভ্য হওয়া।
- গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং জন্ম ও মৃত্যুর হার হ্রাস পাওয়া।
- বেকার সমস্যা সর্বনিম্ন স্তরে থাকা।
- কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়া।
- বাসস্থান সমস্যা লাঘব এবং উন্নততর হওয়া।
- আয় ব্যয়ের সমতা স্থিতিশীল থাকা।
- জনগণ মুক্ত ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করে জাতীয় উন্নয়নে সম্পৃক্ত থাকা।
- সর্বক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হওয়া।
- সর্বস্তরে শিক্ষার হার ও মান প্রসারিত হওয়া।

এসব গুণগত মান পরিবর্তনের মাধ্যমেই উন্নত জীবন ধারাই অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত মানদন্ড হিসেবে সমর্থন পাওয়ার দাবি রাখে।

স্বাস্থ্য ও পুষ্টিঃ কর্মক্ষম জনশক্তির উপর উন্নয়নের গতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। কর্মক্ষম জনশক্তি আবার পুষ্টি মানের খাবার ও স্বাস্থ্য সুবিধার উপর অনেকটা নির্ভর করে। অতএব দেশের জনগণের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সূচক অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম মানদণ্ড হতে পারে।

অবকাঠামোগত অবস্থাঃ যে কোন উন্নয়নের প্রধান শর্ত উন্নত যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়ন সাধন। তাই কোনো দেশের অবকাঠামোগত অবস্থাকে উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে গণ্য করা যায়।

গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবেশঃ জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের জন্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ রাজনৈতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে রাষ্ট্রীয় কাঠামো। যার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সহমর্মিতা এবং গ্রহণযোগ্যতা। এই অর্থে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক পরিবেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক হিসেবে বিবেচিত হয়।

দারিদ্র্য ও বেকারত্বঃ যখন কোন দেশের জনগণের দারিদ্র্যতা, বেকারত্ব এবং আয় বৈষম্য ক্রমশ হ্রাস পায় তবেই ঐ দেশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়েছে বলা যায়।

শহর নগর গ্রামের পার্থক্যঃ শহর নগর ও গ্রামের সার্বিক সুযোগ সুবিধার পার্থক্য দ্বারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা যায়। কারণ উন্নত দেশগুলোতে এ ধরনের কোন পার্থক্য নেই এবং সবাই সমান সুবিধা ভোগ করে।

পক্ষান্তরে অনুন্নত দেশে এই পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট।

নাগরিক সুবিধাঃ যে দেশের মানুষ কথা বলার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, তথ্য আদান প্রদান অধিকার, মানবাধিকার, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের পাশাপাশি অন্য সব নাগরিক সুবিধা ভোগ করে, সে দেশ অর্থনৈতিকভাবে তত উন্নত।

সামাজিক নিরাপত্তাঃ যে দেশের সামাজিক নিরাপত্তা যতবেশি সুদৃঢ় সে দেশ অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে তত উন্নত বলা যায়। কারণ সামাজিক নিরাপত্তা দুর্বল বা নিশ্চিত না হলে সামাজিক অস্থিতিশীলতা বেড়ে যাওয়ায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্থ হয়।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামো– সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কাঠামো উন্নয়নের জন্য কুসংস্কারমুক্ত ও গতিশীল প্রক্রিয়া যথেষ্ট সহায়ক। তাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক বা মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

সুশাসন ও প্রশাসনিক দক্ষতাঃ সমাজের সকল ক্ষেত্রে সরকারের সুশাসন ও প্রশাসনিক দক্ষতা, স্বচ্ছতা এবং নির্ভরযোগ্যতা অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। কারণ শাসন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা ও নিরপেক্ষতা থাকলে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অরাজকতা সৃষ্টি হতে পারে না।

মানব সম্পদ উন্নয়নঃ জনসংখ্যা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রধান নির্ধারক হিসেবে গণ্য হয়। কারণ দেশে প্রচুর সম্পদ থাকলে ও যদি উন্নত ও দক্ষ মানব সম্পদ না থাকে তবে তার সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা যায় না। এতে সার্বিক উন্নয়ন ব্যহত হয়। কারণ সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার ও সেবা উৎপাদনে উপযোগী ব্যবহার সম্পর্কে দক্ষতার অভাব পরিলক্ষিত হয় বিধায় উন্নয়নের ক্রমধারা ব্যাহত হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদঃ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নিজস্ব এলাকা জুড়ে ভূমি, বন, আবহাওয়া, খনিজ, জলজ ইত্যাদি হলো প্রাকৃতিক সম্পদ। কোন দেশে পর্যাপ্ত পরিমাণে এসব সম্পদ থাকলে এবং এ সকল উন্নত সম্পদের যথাযথ ব্যবহার, সংরক্ষণ এবং পরিচর্যার মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন হতে পারে।

মূলধন গঠনঃ মূলধন গঠনের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষভাবে নির্ভর করে। মূলধন বলতে এমন সব উৎপাদিত দ্রব্য বোঝায় যা অন্যান্য পণ্য উৎপাদনের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন– শিল্পায়নের জন্য ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি কোন ইস্পাত শিল্পের উৎপাদিত পণ্য। এগুলি আবার অন্য কোন শিল্পের পণ্য উৎপাদনের জন্য উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তাই যে কোন যন্ত্রপাতিকে মূলধন হিসেবে গণ্য করা যায়। সুতরাং মূলধনের যত বেশি ব্যবহার হবে অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত বেশি বৃদ্ধি পাবে।

কারণ মূলধন–

- বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে সহায়ত করে।
- মূলধন দ্রব্যের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে।
- দেশের শ্রমশক্তির দক্ষতা অর্জনে মূলধন সহায়তা করে।
- উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো ইত্যাদির উন্নয়ন মূলধন গঠনের সাহায্যে দ্রুত সম্ভব হয়।
- বাজার সম্প্রসারণে মূলধন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এছাড়াও পানি ও বিদ্যুৎ-এর ব্যবহার, গাড়ির ব্যবহার, উন্নত মানসিকতা, টেলিফোন ও ইন্টারনেটের ব্যবহার, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, পুষ্টি গ্রহণ, আচরণের পরিবর্তন, শ্রমের মর্যাদা ইত্যাদি সূচকের সাহায্যেও অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. চলক বলতে কী বোঝায়?
   ক. উন্নয়ন পরিমাপের মাপকাঠি
   খ. পরিমাপের সূচক
   গ. উন্নয়ন তরান্বিতকরণ প্রক্রিয়া
   ঘ. উন্নয়নে গতিশীলতা বৃদ্ধি করা

২. জাতীয় জীবনে উন্নয়নের প্রধান পরিমাপক হচ্ছে–
   ক. অর্থনীতি স্বনির্ভর করা
   খ. বিদেশী প্রযুক্তি নির্ভর হওয়া
   গ. উৎপাদনে পরিমাণ বৃদ্ধি করা
   ঘ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করা

উত্তরমালা: ১. গ, ২. ক।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জাতীয় উন্নয়নের নির্ণায়কগুলো কী কী?
২. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন বলতে কী বোঝায়?
৩. জাতীয় উন্নয়নে গণতান্ত্রিক- রাজনৈতিক পরিবেশের প্রভাব বর্ণনা করুন।

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নের নির্ণায়কগুলোর গুরুত্ব উল্লেখপূর্বক বিস্তারিত বর্ণনা করুন।
২. জাতীয় জীবনে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান পরিমাপক হচ্ছে মাথাপিছু আয়। বিশ্লেষণ করুন।
৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নে মূলধনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

পাঠ ২.৬: প্রত্যাশিত জীবনকাল, জীবনযাত্রার মান

জীবনযাত্রার ধরন বলতে ক্ষেত্র বিশেষে প্রয়োজনীয় উপকরণ, যেমন- অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও ভোগ্যপণ্য ইত্যাদিকে বোঝায়। অর্থাৎ যে যতবেশি ভোগ করে এবং যত বেশি উন্নত সুন্দর পরিবেশে জীবনযাপন করে তার জীবনযাত্রার মান তত বেশি উন্নত বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং জীবনধারণের মানকে জীবনযাত্রার মান বলা হয়। যে দেশের জনগণ উন্নত পরিবেশে উন্নতমানের জীবনধারণের সকল সুবিধা ভোগ করে সে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান তথা জীবনধারণ তত উন্নত বলে ধরে নেওয়া হয়। তাই আমেরিকা, কানাডা, কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া, চীন, জাপানসহ উন্নত দেশসমূহের জনগণের জীবনধারণ প্রক্রিয়া অতি উন্নত। অতএব, মানুষ কিভাবে, কোন পরিবেশে জীবনযাপন করে ও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা কতটুকু লাভ করে তাকে **"জীবনযাত্রার মান"** বলা হয়।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি–

- জীবনযাত্রার মান সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নিম্ন জীবনযাত্রার মানের প্রধান কারণগুলো উল্লেখ করতে পারবেন;
- জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির উপায়গুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

অর্থনৈতিক উন্নয়ন হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি দেশে দীর্ঘকালব্যাপী জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে জাতীয় আয় বৃদ্ধির একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া বলা যায়। অর্থনীতিবিদগণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিমাপের মাপকাঠি হিসেবে তিনটি উপাদানকে প্রাধান্য দিয়েছেন। যেমন:

- মোট জাতীয় আয় বৃদ্ধি
- মাথাপিছু প্রকৃত আয় বৃদ্ধি
- জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি।

এ তিনটির মধ্যে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ যে সকল দেশের জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায় সে সকল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তত দ্রুত গতিতে বাড়ছে। ফলে জনগণের কল্যাণ বাড়ে, জীবনযাত্রার মান ও উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির পাশাপাশি জনগণ তাদের চাহিদা পূরণে সক্ষম হলে তাকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বলা যেতে পারে।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এ দেশের অর্থনীতি নানা সমস্যায় জর্জরিত। তাই মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে খুবই নিচু। বাংলাদেশের স্বল্প মাথাপিছু আয় ও নিম্ন জীবনযাত্রার মানের প্রধান কারণসমূহ নিম্নরূপ:

- ঔপনিবেশিক শোষণ;
- জনসংখ্যার আধিক্য;

- প্রাকৃতিক সম্পদের অপূর্ণ ব্যবহার;
- বেকারত্ব;
- সম্পদের অসম বণ্টন;
- অনগ্রসর শিল্প;
- অনুন্নত কৃষি;
- অদক্ষ জনশক্তি;
- সুশাসনের অভাব;
- স্বল্প মজুরি;
- মূলধনের অভাব;
- পরিকল্পনার অভাব;
- দুর্বল অবকাঠামো;
- আধুনিক প্রযুক্তির অভাব;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ;
- পণ্যমূল্য বৃদ্ধি;
- শিক্ষার গুণগত মান;
- স্বল্প রপ্তানি আয়;
- সম্পদ পাচার;
- নির্ভরশীলতা;
- বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব;
- যোগ্যতার অভাব;
- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা।

অতএব, উপরোক্ত কারণসমূহ বাংলাদেশের জনগণের স্বল্প মাথাপিছু আয় ও নিম্ন জীবনযাত্রার মানের জন্য অনেকাংশে দায়ি।

জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির উপায়

বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভর দেশ। জাতীয় উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দেশের জনসংখ্যার মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির জন্য জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে। তথ্য ও প্রযুক্তিনির্ভর দক্ষতা অর্জনে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সর্বোপরি জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে বিভিন্ন উপায় গ্রহণ করতে হবে। যেমন:

- জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ;
- দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষার উন্নয়ন;
- কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- আয়ের সুষম বণ্টন;
- যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন;
- মূলধন গঠন;
- শিল্পোন্নয়ন;
- কৃষিক্ষেত্রে আধুনিকায়ন;

- কৃষি শিক্ষার প্রসার;
- নিরক্ষরতা দূরীকরণ;
- সুশাসন নিশ্চিত করা;
- সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার;
- মুদ্রাস্ফীতি রোধ;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধ;
- বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;
- জনশক্তি রপ্তানি বাড়ানো;
- অবকাঠামোগত উন্নয়ন;
- সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহণ;
- পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ;
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা;
- দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন;
- রপ্তানি বৃদ্ধি/আমদানি ব্যয় হ্রাস;
- দারিদ্র্য বিমোচন;
- শ্রমশক্তির পরিমাণ বাড়ানো;
- সামাজিক অবকাঠামো উন্নতকরণ;
- আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা;
- নৈতিক শিক্ষার প্রসারণ;
- শ্রমের মর্যাদা প্রদান।

উপর্যুক্ত উপায়গুলো অনুসরণপূর্বক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হলে বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ও জীবনযাত্রার মান উন্নীতকরণে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

ক. বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. অর্থনৈতিক উন্নয়নকে জাতীয় আয় বৃদ্ধির–
   ক. প্রধান নির্ণায়ক হিসেবে গণ্য করা হয়
   খ. এটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া
   গ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি
   ঘ. উন্নত জীবন ধারণ প্রক্রিয়া

২. বাংলাদেশে স্বল্প মাথাপিছু আয়ের কারণ–
   ক. শিক্ষার অভাব/জনসংখ্যার আধিক্য
   খ. কর্মসংস্থানের অভাব/বেকারত্ব
   গ. শ্রমের মর্যাদার অভাব/স্বল্প মজুরি
   ঘ. অর্থনৈতিক নানান সমস্যা/সম্পদের অসম বন্টন

৩. বাংলাদেশে নিম্ন জীবনযাত্রার মানের কারণ–
   ক. অদক্ষ জনশক্তি
   খ. পণ্যমূল্য বৃদ্ধি
   গ. ক্ষেত্র বিশেষে সমন্বয়হীনতা
   ঘ. পরিকল্পনার অভাব

৪. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে–
   ক. জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তর করতে হবে
   খ. প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ
   গ. মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকরণ
   ঘ. যথাযথ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিকরণ

উত্তরমালা: ১. খ, ২. ক, ঘ, ৩. সবকটি, ৪. সবকটি।

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জীবনযাত্রার মান বলতে কী বোঝায়?
২. স্বল্প মাথাপিছু আয় ও নিম্ন জীবনযাত্রার মানের কারণগুলো কি কি?

গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জনগণের স্বল্প মাথাপিছু আয় এবং নিম্নমুখী জীবনযাত্রার মানের কারণগুলো বাখ্যা করুন।
২. জাতীয় উন্নয়নে জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি করার উপায়গুলো সংক্ষেপে লিখুন।
৩. বাংলাদেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের ভূমিকা উল্লেখ করুন।